প্রা স ঙ্গি ক

১৯১৫ সালে *ভারতী* পত্রিকার একটি সংখ্যায় (মাঘ, ১৩২২) দস্তইয়েভ্স্কির জীবন ও দর্শন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ (*ফেওদর ডোস্টোয়েভস্কি*) লিখেছিলেন সুধাংশুকুমার চৌধুরী। ভূমিকায় তাঁর মন্তব্যও ছিল: "বাস্তবতা রুশ ঔপন্যাসিকগণের স্বাভাবিক ধর্ম হইলেও ডোস্টোয়েভস্কির মতন এত নিবিড়ভাবে আর কোন রুশ লেখক বাস্তবতাকে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।"

সেই একই বছর দস্তইয়েভ্স্কির উপন্যাসের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। রুশ ভাষায় *ক্রোত্কায়া* (ইংরেজি অনুবাদে *The Meek One, The Gentle Creature, The Gentle Spirit*) নামে সেই উপন্যাসটির বাংলা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অনুবাদে *সুচরিতা* নামে *ভারতী* পত্রিকার বাংলা ১৩২২ মাঘ (৩১ বর্ষ, দশম সংখ্যা) থেকে ফাল্গুন (৩১ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা), চৈত্র (৩১ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা) পর্যন্ত মোট তিনটি কিস্তিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ভূমিকায় অনুবাদক লিখেছিলেন, "ডোস্টোয়েভ্স্কির যে ক্ষুদ্র উপন্যাসখানির অনুবাদ আরম্ভ হইল লেখক তাহাতে দেখাইতে চাহিতেছেন একজন সুদখোর কর্কশ স্বভাব মহাজন

প্রেমের মহিমায় কিরূপ সদাশয় হইতে চেষ্টা করিতেছে।” এটা অবশ্য রচনার বিষয়বস্তুর অতিসরলীকরণ। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

বিষয়টির উল্লেখ এই কারণেই যে দস্তইয়েভ্স্কির শুধু এই উপন্যাসটিরই নয়, তাঁর যে-কোনও রচনার এটাই বোধহয় বাংলায় অনুবাদের প্রথম প্রয়াস; যদিও অনুবাদ, বলাই বাহুল্য ইংরেজি অনুবাদ থেকে এবং অনেকটাই ভাবানুবাদ, কতকাংশে সংক্ষেপিতও।

১৮৬৯ সালে দস্তইয়েভ্স্কির বয়স যখন ৪৮ বছর, সেই সময়ে তিনি এমন একটি কাহিনির কথা ভেবেছিলেন যেখানে নায়ক বিপত্নীক, নিঃসঙ্গ, ঈর্ষাপরায়ণ, খুঁতখুঁতে ও কোপন স্বভাবের, তবে বেশ ভদ্র ও মার্জিত।

দস্তইয়েভ্স্কি তাঁর নোটবইতে লিখেছিলেন: নায়ক পেশায় বন্ধকের কারবারি। একটি মেয়ে নায়ককে নিজের দুঃখের কাহিনি শোনায়, মেয়েটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। ১৮৭০-এ এবং তারও পরে নোটবইতে নায়ক সম্পর্কে কিছু মন্তব্য থাকলেও গল্পটি আর এগোয়নি। দস্তইয়েভ্স্কির আরও অনেক প্লটের মতো এটিও শেষকালে পরিত্যক্ত হতে পারত অথবা অন্য কোনও কাহিনির অন্তর্ভুক্ত কোনও এপিসোড হতে পারত, যেটা দস্তইয়েভ্স্কির *অপরাধ ও শাস্তি* (*প্রেস্তুপ্লিয়েনিয়ে ই নাকাজ়নিয়ে*) বা *কারামাজভ্ ভাইয়েরা* (*ব্রাতিয়া কারামাজ়োভি*)-র মতো অনেক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ এ নিয়ে তিনি পৃথক কোনও গল্প বা উপন্যাস নাও লিখতে পারতেন।

লেখকের নিবেদন

আমি যে আকারে সচরাচর 'দিনলিপি' লিখে থাকি, এবারের কিস্তিতে তার বদলে নিছক একটি আখ্যান পরিবেশন করছি, সেজন্য পাঠকদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু মাসের একটা বড়ো অংশ আমি সত্যি সত্যি এই আখ্যানটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। সে যা-ই হোক, পাঠক যেন আমাকে মার্জনা করেন!

এবারে আখ্যান প্রসঙ্গে আসা যাক। যদিও আখ্যা দিয়েছি 'একটি কল্পকথা', তবু আমি নিজে এটিকে চূড়ান্ত বাস্তবধর্মী বলে মনে করি। তা, কাল্পনিকতা এখানে বাস্তবিকই আছেও, বিশেষ করে গল্পের আঙ্গিকে, আর প্রাথমিকভাবে, আমার মনে হয় তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজনও আছে।

কথাটা এই যে, এটি কোনও গল্পকথা নয়, আবার টুকরো টুকরো কিছু বৃত্তান্তের সংকলনও নয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে যে মহিলা জানলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, তার মৃতদেহ যখন ঘরে টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে সেই সময় তার স্বামীর মনের অবস্থাটা কেমন হতে পারে, একবার ভেবে দেখুন। সে বিভ্রান্ত, এখনও নিজের ভাবনাচিন্তা ঠিকমতো গুছিয়ে উঠতে পারেনি। ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, যা ঘটেছে তা হৃদয়ঙ্গম

করার এবং নিজের ভাবনাচিন্তাগুলিকে গুছিয়ে এক বিন্দুতে জড়ো করার চেষ্টা করছে। তাছাড়া মানুষটা আবার সাংঘাতিক বাতিকগ্রস্ত; সে তাদেরই একজন যারা নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে কথা বলে। তাই সে আপন মনে কথা বলে চলেছে, যা যা ঘটেছে সব বলে যাচ্ছে, নিজেই নিজের কাছে স্পষ্ট হতে চাইছে। তার কথার মধ্যে আপাত পারম্পর্য থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই, যেমন তার যুক্তিতে তেমনি তার উপলব্ধির মধ্যেও, স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়। সে নিজেকে নির্দোষ মনে করছে, তার স্ত্রীকেই দোষী সাব্যস্ত করছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা অবান্তর ব্যাখ্যাও দিয়ে বসছে: হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের এ একরকম মূঢ়তা, যার সঙ্গে মিশে আছে কোনও এক গভীর অনুভূতিও। অল্প অল্প করে বিষয়টা সে নিজের কাছে বাস্তবিকই স্পষ্ট করে তুলতে থাকে, নিজের চিন্তাভাবনাগুলিকে গুছিয়ে সংহত করতে থাকে। একের পর এক যে সমস্ত স্মৃতি তাকে তাড়া করে ফিরছিল সেগুলি সব একসঙ্গে মিলে শেষকালে তাকে অবধারিতভাবে এমন এক সত্যে পৌঁছে দেয় যে সত্য অবধারিতভাবে তার হৃদয়বৃত্তির ও চিন্তাশক্তির উন্নতি সাধন করে। এমনকি যেরকম অসংলগ্নভাবে আখ্যানের সূচনা হয়েছিল, শেষের দিকে এসে তার সুর পর্যন্ত পালটে যায়। হতভাগ্য মানুষটার কাছে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়, যথেষ্ট পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে— অন্ততপক্ষে তার নিজের বোঝার মতো করে তো বটেই।

এই হল বিষয়বস্তু। আখ্যান বর্ণনা অবশ্য মাঝে মাঝে বাধা পেয়ে থমকে থাকে, কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া ভাবে কয়েক ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে: এই সে নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলছে, আবার পরক্ষণেই যেন কোন্ অদৃশ্য শ্রোতাকে লক্ষ করে, কোন্ অদৃশ্য বিচারকের

১৯৩১-এ নভেলাটির জন্য আলেকজান্ডার সুরিকভ্-এর অলংকরণ

এক

সে কে ছিল, আমিই বা কে?

...এই যে এখনও সে এখানে, আপাতত সেটা ভালোই বলতে হবে। আমি প্রতি মুহূর্তে কাছে গিয়ে ওকে দেখে আসতে পারছি। কিন্তু কালই তো ওকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন... তখন আমি কী করে একা পড়ে থাকব? এখন সে আছে সামনের বড়ো ঘরে, টেবিলের ওপর—তাস খেলার দুটো টেবিল জোড়া দিয়ে তার ওপর ওকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। কাল নাগাদ কফিন তৈরি হয়ে যাবে... সাদা ধবধবে... কিন্তু না, কথাটা তা নয়... আমি পায়চারি করছি তো করছিই, নিজেই নিজের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে চাইছি ব্যাপারটা। এই তো ছয় ঘণ্টা হয়ে গেল আমি সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কোনোমতেই সব ভাবনাচিন্তাকে গুছিয়ে এক বিন্দুতে জড়ো করতে পারছি না। আমি পায়চারি করছি তো করছিই। ...কী ঘটেছিল সেটা বলি। আমি স্রেফ শৃঙ্খলা মেনে পরপর বলে যাব। ওঃ, শৃঙ্খলা বলে কথা! ভদ্রমহোদয়রা, আমি আদৌ সাহিত্যিক নই, সে তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তা হোক, তবু আমি যা বলার তা বলব, যেমন আমি নিজে বুঝি সেইভাবে বলব। আমার সমস্ত

আতঙ্কের মূল তো এখানেই যে আমি সব বুঝতে পারছি।

তা আপনারা যদি জানতে চান, অর্থাৎ কিনা যদি একেবারে গোড়া থেকে ধরতে হয়, তাহলে বলি, সে প্রথমে আমার কাছে এসেছিল স্রেফ জিনিস বন্ধক দিয়ে টাকা ধার নিতে। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে সাত-পাঁচ জানিয়ে *দৈনিক কণ্ঠস্বর*-এ বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য টাকা জোগাড় করা ছিল তার উদ্দেশ্য। সে যে-কোনও পরিবারে থেকে বাড়ির ছেলেমেয়েদের গভর্নেস হতে চায়, তাতে প্রয়োজন হলে দূরে যেতেও তার আপত্তি নেই, বাড়ি গিয়ে পাঠ দিতেও রাজি—ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল সেই বিজ্ঞাপনের মর্ম। সেটা ছিল কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার একেবারে শুরুর দিকে। আমিও অবশ্য তখন তাকে অন্য আর দশজনের থেকে আলাদা চোখে দেখিনি: আসে, আর সকলে যেমন আসে, এই আর কি। কিন্তু পরে তফাত করতে শুরু করলাম। সে ছিল বেশ রোগাপাতলা, মাঝারি উচ্চতার চেয়ে মাথায় সামান্য একটু লম্বা, মাথার চুল শণের মতো ফ্যাকাশে হলুদ। আমার সঙ্গে ব্যবহারে সবসময় কেমন যেন আড়ষ্ট, থতমত খাওয়া মতন। আমার মনে হয়, যে-কোনও বাইরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারে সে এই একই রকম। আর আমি তো বলাই বাহুল্য, তার পক্ষে এ-ও-সে যে কারোরই মতন, অর্থাৎ যদি আমাকে বন্ধকের কারবারি না বলে নিছক একজন মানুষ হিসেবে ধরা হয়। যেইমাত্র টাকা পাওয়া অমনি উলটো দিকে ঘুরে চলে যেত সে। সবই নীরবে। অন্যেরা সব তর্ক জুড়ে দেয়, বায়না করে, দরদস্তুর করে যাতে আরও বেশি কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু এ সেসবের কিছুই করে না, যা দেওয়া হল তাতেই..., না, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন সব গুলিয়ে ফেলছি। ...ও হ্যাঁ,